তারিখ ... 12 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৫

যুগান্তর

ড. মো. শরিফ উদ্দিন

'বিচ্ছিন্ন' জনপদের প্রাথমিক শিক্ষা

দেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়েছে, বিষয়টি গণমাধ্যমেও উঠে এসেছে। আমরা গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টি নিয়ে কখনও গুরুত্ব সহকারে কখনও কম গুরুত্ব দিয়ে ভেবেছি। তবে আমাদের সমষ্টিগত ভাবনা যেমনই হোক স্বীকার করতে হবে যে, প্রাথমিক শিক্ষা এগিয়েছে। আগের সঙ্গে যদি তুলনা করি, তাহলে একথা মানতেই হবে। তবে প্রশ্ন থেকে যায়, এই এগিয়ে যাওয়ার কাঙ্ক্ষিত কাঙ্ক্ষিত মানের হয়েছে কি-না, কিংবা প্রাথমিক শিক্ষার সুষম বণ্টন হয়েছে কি বাংলাদেশের সব সমাজে? বড় প্রশ্নটি আসলে এখানেই। বৈষম্যের কথাই ঘুরেফিরে সামনে আসে বারবার, বৈষম্যটি ঘটেছে মোটাদাগে, যেটি খালি চোখেও ধরা পড়ে। এটি সারা দেশের প্রাথমিক শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতির প্রশ্নটির মীমাংসা না করেও বলা যায়।

সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার কিংবা নেত্রকোনা জেলার হাওর বেষ্টিত সমাজের কথাই যদি বলা হয়, সেখানকার মানুষের জীবনযাত্রা কেমন, কেমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দশা, পাঠ পদ্ধতি, শিশুরা সেখানে কীভাবে বিদ্যালয়ে যায়? দলবেঁধে বিদ্যালয়ে যাওয়ার যে দৃশ্য আমরা দেখে অভ্যস্ত, সেই ব্যাপারটি কি ঘটে এসব জলমগ্ন অঞ্চলের শিশুদের জীবনে? সেখানে শিশুরা বিদ্যালয়ে যেতে বাধার শিকার হয় পরিবার থেকে। তাদের কি বিদ্যালয়ের পরিবর্তে নৌকা নিয়ে বাবার কিংবা বড় ভাইয়ের সঙ্গে মাছ শিকারে যেতে হয়? মেয়েদের কি সেখানে গৃহস্থালির কাজে বাধ্য করা হয়, কিংবা গৃহস্থালি শিখলেই বিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে বসানো হয় বিয়ের আসরে?

হাওর বেষ্টিত মানুষজন, বিশেষ করে সেখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা তাদের জীবনের যে ব্যাখ্যা দিতে চান, তাকে সহজ ভাষায় বলা চলে 'বিচ্ছিন্ন' জীবন। 'বিচ্ছিন্ন' জীবনে এসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মীমাংসা না করে শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত মান নিয়ে আলোচনা আমাদের কাছে অর্থহীন মনে হয়।

বাংলা পঞ্জিকানুসারে আষাঢ় ও শ্রাবণ এ দু'মাসে ঢলে ভেসে যায় মানব চরাচর। সাধারণভাবে আমরা যারা সমতল ভূমিতে বসবাস করি তাদের কাছে এই বৃষ্টির মাহাত্ম্য ভিন্ন। কিন্তু যারা হাওরের বাসিন্দা তারা জানেন বর্ষাকাল তাদের কতখানি বিচ্ছিন্ন করে ফেলে সাধারণ সমাজ-দেশ থেকে। প্রশ্ন উঠতে পারে, এ সময়ে হাওরের মানবজীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়গুলো স্থবির হয়ে পড়ে, প্রাথমিক শিক্ষা তো পরের বিষয়। হ্যাঁ, এ দুঃসময়ে তারা কোনোভাবে খাবারের সংস্থান করতে পারলেও দেহের ভেতর অনিরাময়যোগ্য ক্ষত নিয়ে কীভাবে প্রাণ দিতে হয়, তা এ অঞ্চলের বাসিন্দারা ভালো জানেন। কমবেশি বলতে পারবেন তারাও যারা সেখানে মাঝেমধ্যে যাতায়াত করেন— আহারহীন, চিকিৎসাহীন দুর্দশাগ্রস্ত এ এক অন্য জীবন।

দুর্ভোগ শুধু এ দু'মাসেই নয়, এ পরিস্থিতি বর্ষার আগে ও পরের আরও দু'-তিন মাসও মানুষের জীবনকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। এ সময়ে মানুষ সাধারণ বা ইঞ্জিনচালিত নৌকার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। যতই জরুরি প্রয়োজন হোক, মাইলের পর মাইল পথ নৌকাতেই যেতে হয়, বিকল্প ব্যবস্থা আজও আবিষ্কার হয়নি। এ বর্ষায় হাওরে সাগরের মতো ঢেউ ওঠে, যা সবকিছু দুমড়ে-মুচড়ে নিয়ে যেতে চায়। মানুষ ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ে। শিশুরা পরিবার থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন বিদ্যালয়ে যেতে। অস্বাভাবিক পানি বৃদ্ধি মানুষের জীবনকে একদিকে নানা অনিশ্চয়তায় ফেলে দেয়, অন্যদিকে পানি যখন স্থিতিশীল অবস্থায় থাকে, পরিবারের বড়দের সঙ্গে শিশুদেরও বিদ্যালয়ের পরিবর্তে যেতে হয় মাছ শিকারে। এ মৌসুমে হাওরে মাছ শিকার অনেক সহজ হয়ে পড়ে এবং এটি আয়ের তুলনামূলক সহজ মাধ্যমও। এজন্য বাবা-মা উদ্যোগী হন না নিজের বাচ্চাকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে। এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘটে থাকে ছেলে সন্তানদের ক্ষেত্রে, আর যারা মেয়েশিশু, তাদের ব্যস্ত রাখা হয় গৃহস্থালির কাজে, যখন পরিবারের তুলনামূলক বড় সদস্যরা ব্যস্ত থাকেন মাছ ধরার কাজে। মেয়েশিশুদের ভাগ্যে আরও যে একটি অশুভ ব্যাপার ঘটে সেটি হল, বাল্যবিয়ে। তারা যখন মোটামুটি ঘর-গৃহস্থালি সামাল দিতে শিখে ফেলে, বাবা-মা তখন ওই সন্তানকে বিয়ে দিতে উদ্যত হন। এটি এ অঞ্চলের খুব সাধারণ ঘটনা।

এ পরিস্থিতিতে কীভাবে প্রাথমিক শিক্ষাকে সফল করা সম্ভব সে বিষয়ে সরকারের কোনো পরিকল্পনা নেই, যা হতাশাজনক। ধরা যাক, বর্ষাকাল এলে এখানে সব কর্মকাণ্ডে মন্থরগতি নেমে আসে, বিষয়টি কারও অজানা নয়। কিন্তু কীভাবে এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ঘটানো যায়, তা খুঁজে বের করা কি সরকারের শিক্ষা দফতরের কাজের আওতাভুক্ত নয়? অথচ সত্য হল, এই 'বিচ্ছিন্ন' জনপদের জন্য কোনো বিশেষ পরিকল্পনা নেই, বরং গোটা দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য যে

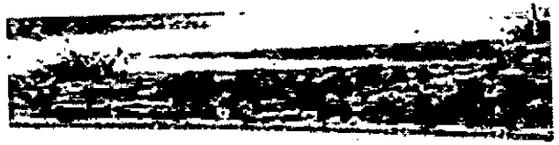

একটি অভিন্ন নকশা করা হয়েছে, তা এখানকার জীবন ব্যবস্থার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। যেমন, বর্ষাকালে পানিবেষ্টিত প্রাথমিক বিদ্যালয়পড়ুয়াদের জন্য সরকারের কোনো পরিকল্পনা নেই। আবার যখন শুকনো মৌসুম আসে, যখন চাষবাসের সময়, তখন পুরোদমে বিদ্যালয় চালু— অর্থাৎ তখনও শিশুদের পড়তে হয় বাধার মুখে, পরিবার থেকে শিশুদের বাধ্য করা হয় আবাদের কাজকর্মে।

সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলার বংশীকুণ্ডা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শামছুদ্দিন আহমেদ বললেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হয় জুনের প্রথম সপ্তাহ থেকে। এ সময়টিতে হাওর এলাকায় তেমন কোনো কাজ না থাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়পড়ুয়া শিশুরা বাড়িতে অবসর সময় কাটায়, অথচ যখন বৈশাখ (এপ্রিলের মাঝামাঝি) মাস আসে, তখন শিশুরাও পরিবারের বড় সদস্যদের সঙ্গে কৃষিকাজে নেমে পড়ে। এ সময় বিদ্যালয়মুখী হয় না তারা। আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বারবার বলেছি, হাওর অঞ্চলে গ্রীষ্মের ছুটি এগিয়ে বৈশাখ মাসে আনা হোক; কিন্তু তা কার্যকরের কোনো লক্ষণ নেই।

এভাবে পদে পদে জলমগ্ন জীবনের শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যেখানে নিয়মিত বিদ্যালয়মুখী হতেই তাদের বেগ পেতে হয়, সেখানে মানসম্মত শিক্ষার প্রশ্ন বহুদূরে অবস্থান করে। সেখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় যেসব সম্মানিত শিক্ষক পাঠ দিচ্ছেন, তাদের দাবি ভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়নের। সমতল অঞ্চলের শিশুদের জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সময়সূচি, সিলেবাস এবং একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করা হলে তা হাওর অঞ্চলের শিশুদের বিশেষ উপকারে আসবে না।

রিসার্চ ফর অ্যাডভান্সমেন্ট অব কমপ্লিট এডুকেশন টিম দেশের এসব দুর্গত অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় যখন কাজ করেছে, আমরা দেখেছি এখানকার বিদ্যালয়গুলোর বাস্তব পরিস্থিতি কতটা ভিন্ন। আমরা পত্রপত্রিকায় যতটুকু পড়ে থাকি, জলাবদ্ধ জীবনের দুর্গম চিত্র তার চেয়েও অনেক দূরে অবস্থান করে। সুনামগঞ্জ জেলারই আরেকটি বিদ্যালয়ের উদাহরণ দেই, ভারতীয় সীমানাঘেঁষে অবস্থিত হাওরবেষ্টিত এ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিরাপদ পানি নেই, বিদ্যুৎ নেই। বিদ্যালয়ে পাওয়া গেল মাত্র একজন সহকারী শিক্ষককে। তার ভাষ্যমতে, বাকি তিনজন শিক্ষকই বিদ্যালয়ের কাজে অন্যত্র গেছেন। সেখানে পঞ্চম শ্রেণীতে মাত্র দু'জন শিক্ষার্থী পড়ালেখা করে। সরকার অন্যান্য বিদ্যালয়ে মাসিক ১০০ টাকা হারে ৮৫ শতাংশ ক্লাসে উপস্থিতির বিনিময়ে কিয়দংশ শিক্ষার্থীর মাঝে যে উপবৃত্তির ব্যবস্থা করেছে এখানে তাও নেই, আছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহযোগিতায় দুপুরে এক প্যাকেট বিস্কুটের ব্যবস্থা। টাঙ্গুয়ার হাওর ও বাইনচাপড়া হাওরের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত বিদ্যালয়ের ওই শিক্ষক জানালেন, 'আজ হাওরের পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত, যেদিন বেশি তুফান ওঠে সেদিন আর বিদ্যালয়ে শিশুদের দেখা মেলে না।'

আর এ অঞ্চলে সেসব শিক্ষক অন্য মানবসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাস করেন। বিদ্যালয়ে এসে নিয়মিত শিশুদের পাঠ দেন। তাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও তো হতাশার শেষ নেই, বেশিরভাগ শিক্ষকেরই অভিযোগ, যে বেতন-ভাতা তারা পান তা দিয়ে সংসার চালানো দায়। নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলার একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দাবি, অন্য শিক্ষকদের বেতন কাঠামো সম্মানজনক অবস্থানে উন্নীত করার পাশাপাশি সরকার যেন প্রধান শিক্ষকদের মর্যাদা দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করে গেজেটেড কর্মকর্তার মর্যাদা দেয়। সরকারের নেতৃস্থানীয়দের এমন প্রতিশ্রুতি রয়েছে বলেও স্মরণ করিয়ে দেন তিনি।

প্রতিযোগিতামূলক পৃথিবীতে টিকে থাকতে হলে দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে এগিয়ে নেয়ার আর কোনো বিকল্প আছে কি? যেখানে গড়ে উঠছে আমাদের আগামী প্রজন্ম, যাদের হাতে আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের চাবিকাঠি। আমরা কীভাবে ভুলে থাকি দেশের পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের শিশুদের কথা? আমরা যদি এসব অনগ্রসর সমাজের শিশুদের যথাযথ পরিচর্যার মাধ্যমে এগিয়ে নিতে পারি, একথা নিশ্চিত করে বলা যায় এরাই দেশকে এগিয়ে নেবে। অন্যদিকে আমরা ব্যর্থ হলে সমগ্র জাতিকেই একদিন এর ফল ভোগ করতে হতে পারে।

ড. মো. শরিফ উদ্দিন : অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়